OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 328 - 336
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারী ও প্রকৃতির আত্মিক সম্পর্ক : ‘রূপকথা ফিরে আসে’

ড. বিশ্বজিৎ বিশ্বাস
অধ্যক্ষ, বিলাসীপাড়া মহাবিদ্যালয়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সরকারি আর্দশ মহাবিদ্যালয়, বিলাসীপাড়া
Email ID : dr.biswasprincipal@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Natural Environment, Built Environment, Eco-Text, Green House, Ecofeminist, C.F.C, C.M.C.

Abstract
A unique Bengali novel with the concept of environmental consciousness by the author Tapan Banerjee ‘Rupkatha Phere Aase’ (2008) is analysed here. The background of the novel is a village called Apanpur, an hour's journey by rail from Calcutta, which was given the name ‘Bankella’ by a village historian. It is well known by that name. Ranima made this village, two kilometers away from Jhau Palash station, full of natural beauty by planting numerous trees of different species. Throughout the year that village was filled with the shade of flowers. The current heirs of the old royal family want to bring modern civilization to the village. Ranima had planted a Shisham tree in the middle of the village entrance. For that tree, no motorized vehicles other than bicycles and rickshaws could enter the village. The village surrounded by numerous trees had the wonderful fragrance of pure air. The current heir to the dynasty cut down the Shisham tree in the middle of the road to drive his hobby car into the 'bankella'. In Bankella village there was an unwritten prohibition of Ranima against cutting trees, which was believed by all the people of the village. But the people of Rajbari broke that rule and cut the first tree in Bankella. It was Ranima who forbade everyone not to cut any tree. She had heard in the prophecy that if the tree is cut down, disaster will come closer to ‘Bankella’. The narrative of the novel begins with the cutting of the Shisham (Dalbergia Sissoo) tree and ends with destruction.

Discussion

এক

কথাশিল্পী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবেশ-ভাবনা সম্বলিত একটি অনন্য উপন্যাস ‘রূপকথা ফিরে আসে’ (২০০৮)। উপন্যাসটির ভূমিকায় ঔপন্যাসিক বলেছেন –

> “প্রকৃতির সঙ্গে কোনও মানুষ বন্ধুত্ব করে, কেউ বা শত্রুতা। সমাজের এই দু’ধরণের মানুষের মধ্যে টানাপোড়েন নিয়ে এই উপন্যাস”[১]

উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা থেকে রেলপথে ঘন্টাখানেকের পথ আপনপুর নামের একটি গ্রাম, যাকে গ্রামের ইতিহাসের এক রানিমা দিয়েছিলেন ‘বনকেল্লা’ নাম। সেই নামেই তার পরিচিত। ঝাউ পলাশ স্টেশন থেকে দু'কিলোমিটার দূরের এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ্রামকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছিলেন রানিমা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য বৃক্ষ রোপন করে। সারা বছর সে গ্রাম ফুলে ফলে ছায়ায় ভরে থাকতো। পুরানো রাজপরিবারে বর্তমান উত্তরাধিকারীরা সেই গ্রামে আধুনিক সভ্যতাকে নিয়ে আসতে চায়। রানিমা গ্রামের প্রবেশ পথের মাঝখানে পুঁতে ছিলেন একটি শিশু গাছ। সেই গাছটির জন্য সাইকেল এবং রিক্সা ছাড়া অন্য কোনও মোটর চালিত যানবাহন গ্রামে প্রবেশ করতে পারতো না। অসংখ্য গাছে ঘেরা সে গ্রামে ছিল নির্মল বাতাসের অপূর্ব সুগন্ধ। রাজবংশের বর্তমান উত্তরাধিকারী তার শখের গাড়িটিকে 'বনকেল্লা'য় প্রবেশ করানোর জন্য রাস্তার মাঝখানের শিশু গাছটিকে কেটে ফেলে। গাছ কাটার প্রতি বনকেল্লা গ্রামে ছিল রানিমা-এর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা, যে নিষেধাজ্ঞাকে বিশ্বাস করতো গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ। কিন্তু রাজবাড়ির মানুষেরাই সে নিয়ম ভেঙে বনকেল্লায় প্রথম গাছ কাটল। রানিমা-ই সবাইকে বারণ করেছিলেন তার পোঁতা গাছ না কাটতে। তিনি নাকি দৈববাণীতে শুনে ছিলেন গাছ কাটলে বনকেল্লায় ঘনিয়ে আসবে সর্বনাশা। উপন্যাসটির আখ্যান শুরু হয়েছে শিশু গাছটির কর্তনের মধ্য দিয়ে আর শেষ হয়েছে সর্বনাশে।

বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় ১৯৪৭ সালে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] দেশভাগের অব্যবহিত পরেই উত্তর চব্বিশ পরগণার ইছামতি নদীর কিনারে বসবাস ও লেখাপড়া শুরু করেন। ষাটের দশকে কলেজে পড়তে চলে আসেন কলকাতায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সরকারি প্রশাসনিক চাকুরির সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বহু বছর কাটিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার-ই প্রতিফলন ঘটেছে তার বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ব্যাভিচারিণী' সাড়া জায়গায়। তারপর 'রাজ্যপালের অসুখ', 'মুখ্যমন্ত্রী উপহার', 'ইঁদুর' প্রভৃতি গল্প পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রশাসনিক চাকুরি সূত্রে দীর্ঘকাল সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে সেখানকার ইতিহাস ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসের বীজ দানা বাঁধে। সুন্দরবনের একশ বছরের ইতিহাস অবলম্বনে লেখা তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসের জন্য লেখক ২০০২ সালে পেয়েছেন রাজ্য সরকারের 'বঙ্কিম পুরস্কার'। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাসের সংখ্যা ত্রিশের কাছাকাছি। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'শঙ্খসমুদ্র', 'শঙ্খচিলের ডানা', 'ডানার দুপাশে পৃথিবী', 'পিঞ্জরের টিয়া', 'ঘাতক', 'অভিশপ্ত অরণ্যে', 'শিকড়ের খোঁজে মানুষ', 'টাঁড় বাংলা উপাখ্যান', 'টাঁড় বাংলার রূপাখ্যান', 'টাঁড় বাংলার রীতিকথা', 'জঙ্গলের রাজা', 'আশ্বিনের বিল', 'চাঁদমারি', 'কোটি কোটি বছরের পাড়ি', 'জীবনের সাত রং', 'রেস কোর্সে রোমি', 'দ্বৈরথ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৩] 'মহুলবনীর সেরেঞ্চ' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়নের পর কাহিনিকার হিসেবে ঔপন্যাসিক পেয়েছেন বি.এফ.জে.এ. পুরস্কার (২০০৫)। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে তিনি পেয়েছেন 'সাহিত্য সেতু' পুরস্কার (১৯৯৩), 'সোপান' পুরস্কার (১৯৯৫), 'অমৃতলোক' পুরস্কার (১৯৯৭), 'সাংস্কৃতিক খবর' সম্মান (২০০১), 'মঞ্জুষ দাসগুপ্ত স্মৃতি' পুরস্কার (২০০৩), 'পাঞ্চজন্য' পুরস্কার (২০০৩), 'প্রতিমা মিত্র স্মৃতি' পুরস্কার (২০০৫), 'ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর' পুরস্কার (২০০৫), 'কৃত্তিবাস সাহিত্য' পুরস্কার (২০০৫), 'নিত্যানন্দ স্মৃতি' পুরস্কার (২০০৫), 'শৈলজানন্দ স্মৃতি' পুরস্কার (২০০৫), 'রূপসী বাংলা' পুরস্কার, 'ত্রিবৃত্ত' পুরস্কার, 'চোখ সাহিত্য' পুরস্কার (২০০৯), শিলচরের 'দ্বিরালাপ স্মারক' পুরস্কার (২০১০), 'তারাশঙ্কর' পুরস্কার (২০১১)। কিশোর সাহিত্য রচনার জন্য 'দীনেশচন্দ্র স্মৃতি' পুরস্কার (২০১১)।[৪] এছাড়া তিনি বাংলাদেশের নানা প্রতিষ্ঠানের কবি সম্মেলনে ও আলোচনা সভায় যোগদান করেন। একবার সাহিত্য আকাদেমির আমন্ত্রণে ভারতীয় লেখক হিসাবে চিনের আন্তর্জাতিক বইমেলায় দুটি বক্তৃতা দেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান সময়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম, খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। অন্যান্য সাহিত্যিকদের মত তাঁকেও গভীর ভাবে নাড়া দিচ্ছে সাম্প্রতিক কালের প্রধানতম সমস্যা পরিবেশ-বিপর্যয়-এর ভাবনা। তাই তাঁর কলমে উঠে আসছে পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্য। তাঁর 'রূপকথা ফিরে আসে' উপন্যাসটি সেই গভীরতর ভাবনার এক সংবেদনশীল 'ইকো-টেকস্ট'।[৫]

দুই

কবিতার দুটি ছত্র দিয়ে শুরু হয়েছে 'রূপকথা ফিরে আসে' উপন্যাসের আখ্যান। দুটি লাইনের অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঔপন্যাসিক প্রকাশ করে দিয়েছেন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবনাকে—

"সবুজ সবুজ ছায়ায় ঘেরা বনকেল্লা গ্রাম
এখন তো আর সে-গ্রাম নেই এখন বিশ্বগ্রাম।"[৬]

আপনপুর নামক একটি অখ্যাত গ্রামকে বনকেল্লায় রূপান্তরিত করেছিলেন রানিমা। গ্রামটির বাস্তব অস্তিত্ব অজ্ঞাত। গ্রামটিকে নিজের মত করে সাজিয়ে ছিলেন তিনি। বাঁশ-ঝাড় থেকে শুরু করে শাল, শিশু, অর্জুন, মেহগেনি, দেবদারু, সেগুন, জারুল, ইত্যাদ সমস্ত শ্রেণির গাছ যেমন তিনি রোপন করেছিলেন তেমনি সমস্ত ঋতুর অসংখ্য ফুলগাছ রোপন করে বনকেল্লাকে স্বার্থকনামা করে তুলেছিলেন। বনকেল্লার রাজা পদ্মরাজ ছিলেন বিলাসী প্রকৃতির মানুষ। তিনি তার পিতা শঙ্খরাজের নামে একটি গড় নির্মাণ করেছিলেন যা সময়ের ব্যবধানে ভুলুণ্ঠিত হয়ে শুধু ঢিবি হয়ে রয়ে গেছে। বনকেল্লার ইতিহাস প্রসঙ্গে উপন্যাসে জানানো হয়েছে—

> "বনকেল্লার যিনি রচয়িতা রচয়িত্রী রাজবাড়ির সেই রাজা-রানিরা আর নেই, শুধু পড়ে আছে বিশাল রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ। রাজা গড়েছিলেন তাঁর রাজত্ব, আর রানিমা পরম মমতায় গড়েছিলেন বনকেল্লা গ্রাম। স্টেশন থেকে নেমে যে-ভাঙা-ইটের রাস্তাটি রওনা দিয়েছে বনকেল্লার উদ্দেশে তার দুপাশে শুধু গাছ আর গাছ। বিশাল গ্রামের ক্যানভাসে সবুজের এক মহোৎসব। আর ঋতুতে ঋতুতে সেই সবুজ ফুঁড়ে নানা রঙের নানা রকমের ফুলের উচ্ছ্বাস। লাল ফুলই সংখ্যায় বেশি কেন না রানিমার পছন্দের তালিকায় লাল ফুলের ছিল অগ্রাধিকার।"[৭]

রানিমা-এর সাজিয়ে তোলা এই গ্রামে তিনি মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন গাছ না কাটার, তাই বনকেল্লায় কেউ গাছ কাটে না। রানিমা বলেছিলেন যে দৈববাণীতে তিনি শুনেছেন রাস্তার দুপাশে পোঁতা এই গাছগুলির কোন একটির নিচে সঞ্চিত আছে এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস। কোন্ গ্যাস তা জানা নেই, কিন্তু সেই বিশেষ গাছটি যদি কেউ কেটে ফেলে তবে গাছের নিচের গ্যাস বেরিয়ে পড়বে বনকেল্লার বাতাসে। সেই গ্যাস মানুষের ফুসফুসে প্রবেশ করলে শুরু হবে প্রবল শ্বাসকষ্ট। তা ছাড়া, কেউ যদি একটি গাছও কখনো কাটে তাহলে রাস্তার উপরের ছাউনি যাবে ফুটো হয়ে। দেখা যাবে নীলের বদলে কালো আকাশে। সেই আকাশ ফুটো হয়ে নেমে আসবে কালো বৃষ্টির ধারা। সেই বৃষ্টির ধারা লাভার মত উত্তপ্ত ও প্রাণ-সংহারী।

এই দৈববাণীকে উপেক্ষা করার প্রথম প্রচেষ্টা করেছিলেন স্বয়ং রাজা পদ্মরাজ। রাজার খুব ইচ্ছে হয়েছিল রাজবাড়ির নাচঘরে তিনি নিয়ে আসবেন একজন সুন্দরী বাঈজিকে, আর সে আসবে আট ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে। কিন্তু বনকেল্লার পথ এতটাই সংকীর্ণ যে আটঘোড়ার গাড়ি সেখানে ঢুকতেই পারবে না। তাই রাজা হুকুম দিয়েছিলেন বনকেল্লার পথে বাঁধা সৃষ্টিকারী গাছগুলিকে কেটে উড়িয়ে দেওয়ার। কিন্তু তার হুকুমে একটি গাছ কাটা শুরু হতেই ঘটল অঘটন। সবাই দেখলো রানিমার দেহ ভাসছে বিশাল কৃষ্ণশায়রের জলে। বনকেল্লার পুরানো ইতিহাসে গাছকাটার সেটাই প্রথম এবং শেষ ঘটনা। কৃষ্ণশায়রের বুকে রানিমার মৃত শরীর ভেসে উঠেছিল বলে সেই বিশাল দিঘির নাম হয়ে যায় 'রানিদহ' বা 'রানিশায়র'। বনকেল্লার সামগ্রিক অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে রানিমা। গ্রামবাসীদের অনেকেই ভাবেন রানিমার অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায় সমস্ত বনকেল্লা জুড়ে। তাই বনকেল্লার বিস্তৃত ভূমিতে রানিমা একটি 'মিথ', একটি বহুশ্রুত রূপকথা।

এই বনকেল্লা গ্রামের-ই ছেলে কৃষ্ণাভ। সে উচ্চ শিক্ষিত চাকুরিজীবী কিন্তু কবিতা লেখা তার মূল প্রবণতা। সে মনে প্রাণে কবি। বনকেল্লার বাসিন্দা বটেশ্বর ও রাজলক্ষ্মীর একমাত্র ছেলে কৃষ্ণাভ হঠাৎ বিয়ে করে নিয়ে আসে টালিগঞ্জের রিজেন্ট-পার্কবাসী এক বড়লোকের কন্যা রচনাকে। রচনা নিজেও শিল্পী। সে ছবি আঁকে। বনকেল্লার একটি বড় প্লটের মধ্যে অবস্থিত এল প্যাটার্নের একটি ছোট্ট একতলা বাড়িতে শুরু হয় কবি কৃষ্ণাভ ও শিল্পী রচনার সংসার। রচনা সংবেদনশীল প্রকৃতিপ্রেমিক। তার আর্টিস্ট সত্তার গভীরে প্রকৃতির প্রতি এক অনাবিল মমতা বাস করে। অন্যদিকে কবি কৃষ্ণাভ চেষ্টা করত তার বনকেল্লা গ্রামটিকে কবিতায় 'জ্যান্ত' করে তুলে এনে শহরের মানুষের কাছে উপহার দিতে। যে দিন তারা বিয়ে করে প্রথম বনকেল্লা গ্রামে প্রবেশ করে সেদিন-ই বনকেল্লা গ্রামে দ্বিতীয়বার প্রথম গাছ কাটা হল। পথের মাঝখানে যে শিশুগাছটি গ্রামের মধ্যে মোটর গাড়ি প্রবেশের পথ দীর্ঘকাল ধরে অবরোধ করে রেখেছিল মেজ তরফের রাজবংশধর চম্পকরাজ তার ছোট মোটর গাড়ি রাজভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক লাগিয়ে শিশু গাছটিকে কেটে ফেলে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রচনা অত্যন্ত সুন্দরী। সে যেদিন কৃষ্ণাভদের বাড়িতে প্রথম বধূ হিসেবে প্রবেশ করে সে দিন-ই গাঁয়ের মহিলাদের দু-একজন কৃষ্ণাভর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছিল —

> "ও মাগো বৌয়ের কী রূপ! এক্কেরে আমাদের রানির পারা! ... রানি না রানি। বনকেল্লার রানি আবার ফিরে এসেছে গো!"[৮]

গ্রামের মানুষেরা সবাই যে রানিমাকে দেখেছে এমন নয়, অথচ মুখে মুখে রচনা রানিমা-এর প্রতিরূপ বলে প্রচারিত হয়ে যায়। যে শিশু গাছটি কেটে ফেলা হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে গ্রামে গুঞ্জন ওঠে। রানিমা চাননি যে তাঁর স্বপ্ন দিয়ে গড়া বনকেল্লা ডিজেল পেট্রোলের ধোঁয়ায় কলুষিত হয়ে যাক। তাই পুঁতে দিয়েছিলেন ওই গাছটিকে যা কালক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়। বনকেল্লা গ্রামেই বাস করেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক যাকে এলাকার লোকেরা বলে 'গাছবুড়ো'। গাছের সঙ্গে তাঁর আছে আত্মিক সম্পর্ক। শিশু গাছটির অকালপ্রয়াণ সে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারে না। নিজের মত করে সে বৃদ্ধ প্রবলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সে রীতিমত পুরোহিত দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে অকালপ্রয়াত শিশু গাছটির শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করে গাছটির গুঁড়ির পাশে তাঁবু খাটিয়ে। রচনা গাছবুড়োর প্রতি সহমর্মী হয়ে ওঠে। তার দুঃখ লাঘব করতে সে ওই এক-ই জায়গায় একটি নতুন শিশু গাছের চারা রোপনের ব্যবস্থা করে রীতিমত অনুষ্ঠান করে, আর সেই কাজটি করান গাছবুড়োর হাত দিয়েই। রচনা নিজেও কিছুদিন সেই গাছটির পরিচর্যা করে। গাছটির বৃদ্ধি শুরু হলে রচনা পরিচর্যার প্রয়োজন কমে গেছে বলে সে দিকটায় আর তেমন যায়নি। কিছুদিন পর কারা যেন সেই শিশু চারাটিকেও উৎপাটিত করে দেয়। গাছবুড়ো সেই শিশুগাছের ঘেরাটোপের মাঝখানে ঢুকে অস্বাভাবিক বাক্যবন্ধে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করে।

রচনা কৃষ্ণাভ-র বাড়িতে দৈনন্দিন গৃহকর্মের পরও যথেষ্ট সময় পায়। সকাল ৮টা নাগাদ কৃষ্ণাভ বেরিয়ে যায় কলকাতায় অফিস করতে, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে যায়। রচনা একা একা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। মানুষের সঙ্গে তার তেমন সখ্যতা নেই। সে গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, গাছের সঙ্গে কথা বলে। পাড়ার লোকেরা যেমন তাকে রানিমা বলে ভাবে তেমনি কেউ কেউ ভাবে তাকে ভুতে ধরেছে। রচনা অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের রদ বদলকে। প্রত্যেকটা ঋতুকে সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে আর ঋতুর বিবর্তনকে সে ধরে রাখে তার ক্যানভাসে। দুপুরবেলা যখন বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন সে ট্রাঙ্ক খুলে আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে বসে ঘরের দরজা বন্ধ করে। কেউ জানতে পারে না তার এই নীরব ছবি আঁকা। কৃষ্ণাভ-র কবিতা নিয়ে নানা কথা হলেও রচনার ছবি নিয়ে কোন কথা হয় না। এক ছুটির দিনে বনকেল্লার পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ দেখতে রচনা বায়না করে কৃষ্ণাভকে সাথে নিয়ে যায়। প্রাসাদে পৌঁছে রচনার মধ্যে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা জেগে ওঠে। তার মনে হয় দীর্ঘকাল সে এই প্রাসাদে বসবাস করেছে। এমনকি প্রাসাদের কোন্ ঘরে কি আছে সেটাও সে কৃষ্ণাভকে বলতে থাকে। কৃষ্ণাভকে সে টেনে নিয়ে যায় ছাদের উপরে একটি অর্ধনগ্ন নর্তকী মূর্তি দেখাতে। সেই মূর্তির মাথায় যে একটা আঘাতের চিহ্ন আছে সেটাও কৃষ্ণাভকে দেখিয়ে দেয়, এমনকি সে আঘাত যে রানিমা-ই করেছিলেন সেটাও বলে কৃষ্ণাভকে। তারপর দোতালায় নেমে সে নাচ ঘরে ঢুকতে চায় এবং সেই ঘরে যে আরো একটি নগ্ন নারী মূর্তি আছে তাও সে কৃষ্ণাভকে জানায়। কৃষ্ণাভ ভয় পেয়ে যায়। প্রশ্ন করে বসে, রচনা জাতিস্মর কিনা।

গ্রামের লোকেরা রচনাকে রানিমার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে অনেক আগেই। কৃষ্ণাভর মনেও সে ধরনের একটা বিশ্বাস জেগে ওঠে কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। রচনা দিন দিন প্রকৃতি পাগল হয়ে ওঠে, যেমনটি ছিলেন রানিমা। শরৎ এল। কাশ ফুলের প্রকাশ রচনার মধ্যে আনে মত্ততা। বনকেল্লা থেকে দূরে রাজবাড়ির বর্তমান প্রজন্ম যেখানে থাকে সেই অঞ্চলের নাম 'রাজভূমি'। রাজভূমিতেই দুর্গা পূজা হয়। রচনা অনেকটা জোর করেই পূজার আগে কৃষ্ণাভকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিমা নির্মাণ দেখতে যায়। রাজভূমির রাজপারিবারের মহিলারাও রচনার চেহারার মধ্যে দেখতে পায় রানিমাকে। রচনার নিজেরও কখনো কখনো সন্দেহ হয় তার অস্তিত্ব নিয়ে। এর মধ্যেই বনকেল্লায় সভ্যতার আগ্রাসন শুরু হয়। ছোট তরফের বিশ্বরাজবাবু রাজভূমির নিকটে কারখানা নির্মাণের জন্য কাজ শুরু করলে মেজতরফের চম্পক রাজবাবুর মধ্যেও কারখানা স্থাপনের ইচ্ছা প্রকট হয়ে পড়ে। রাজভূমিতে ভারি যন্ত্রপাতি ও কারখানা স্থাপন করতে গেলে চাই পথ। তাই প্রয়োজন হয় বনকেল্লার পথের দু-ধারের গাছ কেটে রাস্তার সম্প্রসারণ ঘটানোর। যাতে বড় বড় ট্রাক সে পথে চলতে পারে। ব্যাপক

হারে বৃক্ষ নিধন শুরু হয়ে যায়। রচনা মর্মে মর্মে মরে যেতে থাকে, যেন তার জীবনের সব আলো নিভে গেছে, মুছে গেছে সব রং। সে লক্ষ্য করে কৃষ্ণাভ হারিয়ে ফেলছে তার কবিত্ব। এই হৃত-সর্বস্ব ভগ্ন হৃদয় নিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে না, যেমন বাঁচতে পারেননি বনকেল্লার রানিমা। তাই একদিন রাতে কাউকে না জানিয়ে সে চলে যায় সেই ভগ্ন রাজপ্রাসাদের জীর্ণ নাচঘরে। যেখানে একদিন রানিমা তার বিপথগামী স্বামী পদ্মরাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে কোন পেশাদার নর্তকীর চেয়েও উদ্দাম অশ্লীল ভঙ্গিতে রাতভর নেচেছিলেন এবং শরীর ছাড়াও নারীর যে নিজস্ব সত্ত্বা আছে সেই সত্ত্বার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আত্মহত্যা করেছিলেন রানি দিঘিতে ডুবে। রচনাও তার আত্মার যন্ত্রণায় সেই নাচ ঘরে গিয়ে রানিমার মতই নাচতে থাকে। তারপর এসে নেমে যায় পদ্মে ভরা রানিশায়রের গহীন জলে। পরদিন কৃষ্ণাভ খবর পায় লাল শাড়ী পরা রচনার মৃত শরীর ভেসে উঠেছে রানিশায়রের জলে যেমন এক দিন সেভাবেই ভেসে উঠেছিল রানিমার প্রাণহীন শরীর। রূপকথার এই পুনরাবৃত্তিতেই উপন্যাসের আখ্যানের সমাপ্তি।

তিন

‘রূপকথা ফিরে আসে’ উপন্যাসের এই কাহিনিকে যেমন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যাদু-বাস্তবতার তত্ত্বগত[৯] দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তেমনি নব্য ইতিহাসবাদের ভাবনাকে যুক্ত করেও অগ্রসর হওয়া যায় আলোচনায়। পরিবেশকেন্দ্রিক পাঠের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এই উপন্যাস এক অনন্য উপকরণ, আর বিশেষ ভাবে ‘ইকো-ফেমিনিস্ট’[১০] বা পরমা প্রকৃতিবাদী তত্ত্বের নিরিখেও উপন্যাসটি বিচার্য হতে পারে। আমাদের আলোচনা ক্ষেত্র যেহেতু পরিবেশকেন্দ্রিক সেহেতু আমরা পরিবেশকেন্দ্রিক পাঠের দৃষ্টিতেই[১১] প্রকৃতিও মানুষের পারস্পরিক আন্তর্সম্পর্ক-এর দিকটিকেই প্রাধান্য দেব। ঋতু পরিবর্তন শুধুমাত্র গাছপালা কিংবা প্রাকৃতিক উপকরণের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে না, মানুষের মন ও জীবনেও যে ঋতুর গভীরতর প্রভাব আছে রচনা তার উপলব্ধি দিয়েই কর্ম ব্যস্ততায় বিস্মৃতপ্রায় আধুনিক মানুষকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সেই ঋতু পরিবর্তনকে অনুভব করতে হলে চাই এক শৃঙ্খলাময় সুব্যবস্থিত প্রাকৃতিক পরিবেশ যেখানে থাকবে বৃক্ষ থেকে ঝোপ-ঝাড়, লতা-পাতা, ফুল-ফল, গুল্ম, জলজ উদ্ভিদ, জলাশয়, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ, জীব-জন্তু থেকে মানুষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর একটি সুসংবদ্ধ ‘ইকো-সিস্টেম’। সেই ‘ইকো-সিস্টেম’কে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন বনকেল্লার রানিমা। বনকেল্লার প্রাকৃতিক পরিবেশকে আধুনিক পরিভাষায় ‘Built Environment’[১২] বলে ধরে নিলেও দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তনহীন সুসংহত অবস্থার জন্য সেটা প্রাকৃতিক পরিবেশের (Natural Environment)[১৩] রূপ লাভ করেছে। ফলে বনকেল্লার পরিবেশকে কৃত্রিম বলে ভেবে নেওয়া সম্ভব নয়। বরং রুক্ষ অঞ্চলে এরকম রানিমার মত গভীর নিষ্ঠার সাহায্যেই যে ছায়া-নিবিড় সুশীতল বাস উপযোগী দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা যায় তার-ই দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বনকেল্লার উপর থেকে গাছের সেই ছায়া-নিবিড় আচ্ছাদন সরিয়ে নিলে অন্যান্য গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রজাতির কীট-পতঙ্গ যে হারিয়ে যাবে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের এই হনন ঘটলে ঋতু পরিবর্তনের যে সুস্পষ্ট চিত্র বনকেল্লায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতো তার হদিশ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। চিত্রশিল্পী রচনা রঙের খেলার কারিগর। ঋতু পরিবর্তনে প্রকৃতির মধ্যে যে বিচিত্র রঙ পরিবর্তনের খেলা চলে দিনের পর দিন, সেই খেলার সচেতন পর্যবেক্ষক শিল্পী রচনা। সে দেখতে পায় শুধু ঋতু পরিবর্তন-ই নয়, ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফুলেরা, গাছেরা তাদের রঙ বদলায়। ভোরের আলো আঁধার, সকালের প্রথম সূর্যালোক, দুপুরের দাবদাহ, বিকেলের পড়ন্ত রোদ, সন্ধ্যার রক্তিম আভায় ফুটে ওঠে গাছ ও ফুলের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। সেই অভিব্যক্তিগুলোকে উপলব্ধি করার উপযুক্ত মন এবং বোধ সাধারণত সবার থাকে না। যে দু-এক জনের থাকে; লোকের চোখে তাদের পরিচয় পাগল, অর্দ্ধোন্মাদ বা ভূতগ্রস্ত মানুষ। উপন্যাসে অন্তত দুটি চরিত্রের মধ্যে প্রকৃতি প্রেমের এই ভূতগ্রস্ততাকে আমরা খুঁজে পাই। একজন চিত্রশিল্পী রচনা আর অন্যজন গাছবুড়ো, যে আসলে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। একজন প্রকৃতিকে দেখেন রঙ-এ, রসে, রূপে, রেখায়, আর অন্যজন দেখেন বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ দৃষ্টিতে-গাছের সঙ্গে গাছের, ফুলের সঙ্গে ফুলের সংযোগ ঘটিয়ে উদ্ভিদ ও জীবজগৎ-এর পারস্পরিক আন্তর্সম্পর্কের সূত্র ধরে। উপন্যাসের নায়ক কৃষ্ণাভ সে কবি আবার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী। তার কবির দৃষ্টি এবং অনুভূতি প্রবণ মন থাকলেও ভাবনা ও বাস্তবতার মধ্যে সে ভারসাম্য বজায় রাখতে জানে। ফলে রচনা বনকেল্লার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশের উপরে সভ্যতার আগ্রাসনে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চূড়ান্তভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ভেঙে পড়লেও কৃষ্ণাভর মনে তেমন গভীরতর কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। বরং আর সাত-পাঁচ জন অন্তঃসারশূন্য আধুনিক মানুষের মতই বিশ্বাস করে যন্ত্র-সভ্যতার অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আর, ডিজেল পেট্রোলের ধোঁয়া ওড়ানো ভারি যানবাহন, আকাশচুম্বী কারখানার চিমনি কিংবা অট্টালিকা সেই তথাকথিত সভ্যতার-ই প্রতীক। রচনা কৃষ্ণাভকে স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছিল তার মধ্যেকার ভাবুক কবি সত্ত্বার জন্য। ক্ষণিকের জন্য হলেও কৃষ্ণাভকে তার অসাধারণ বলে মনে হত। বিয়ের পর থেকে ধীরে ধীরে কৃষ্ণাভ তার সেই অসাধারণত্ব থেকে অবস্থান পরিবর্তন করতে করতে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের অতিসাধারণ পর্যায়ে নেমে যায়। ভুলে যায় প্রতিবাদ প্রতিরোধের ভাষা। গাছ কাটার দুর্বিসহ যন্ত্রণায়, বিপন্নবোধের তাড়নায় রচনা যখন কৃষ্ণাভর সম্মুখীন হয়েছে তখন কৃষ্ণাভর দিক থেকে কোন প্রবোধ বা সহযোগ সে পায়নি। বরং তাকে শুনতে হয়েছে বুদ্ধিজীবীর ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ শ্রেণির অনুভূতিহীন ভাষণ। রচনা মর্মাহত হয়েছে।

বৃক্ষচ্ছেদনের বিরুদ্ধে রচনা নিজের মত করে প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছে। বনকেল্লার গাছ-পালা কেটে যখন শূন্য করে ফেলা হচ্ছে, লুঠ করে নেওয়া হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভাণ্ডার তখন রাজভূমির দুর্গা মন্দিরের দেওয়ালে সে গোপনে লাগিয়ে দেয় তার নিজের হাতে আঁকা বনকেল্লার প্রাকৃতিক ঋতুচক্রের অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ক্যানভাস যে ক্যানভাস বাস্তবে আর কোনও দিন দেখতে পাবে না বনকেল্লার মানুষেরা। কারণ প্রবলের কুঠার আঘাতে হারিয়ে গেছে সেই প্রকৃতি। মানুষ দল বেঁধে গিয়ে দুর্গা মণ্ডপের দেওয়ালে টাঙানো সেই বিচিত্র ছবিগুলিকে দেখে, বিমোহিত হয়, কেউবা নীরবে চোখের জল ফেলে কিন্তু রাজশক্তির এই প্রবল প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পারে না। প্রবলের আগ্রাসনকে প্রতিবাদহীনভাবে মেনে নেওয়াও অপমৃত্যুরই নামান্তর। যারা নীরবে সেই অপমৃত্যুকে মেনে নেয় রচনা তাদের মধ্যেকার কেউ নয়। শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকা যে আত্মার অপমান রচনার সংবেদনশীল মন তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে। যে মর্যাদাবোধের জন্য রানিমা একদিন বেছে নিয়েছিলেন আত্মহননের পথ, সেই এক-ই শ্রেণির বোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে প্রাণবন্ত রচনা নিষ্প্রাণ মানুষদের জগৎ থেকে নীরবে প্রস্থান করাকেই সম্মানজনক বলে মনে করেছে। কৃষ্ণাভর মধ্যে যখন স্বজ্ঞান ফিরে এসেছে ততক্ষণে রচনার দেহ ভেসে উঠেছে রানিশায়রের জলে। আর তারপর, রচনার সেই টিনের সিন্দুক যেটাকে খোলা হল উপস্থিত গ্রামবাসীদের সবার সামনে। দেখা গেল তাতে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে বনকেল্লার বিভিন্ন স্থানের ও সময়ের বিচিত্র রঙ-এ রেখার আঁকা অসংখ্য ক্যানভাস। যে প্রকৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে বনকেল্লায় সেই প্রকৃতি ছবি হয়ে জেগে আছে রচনার ক্যানভাসে। এমন কি বাদ যায়নি সেই ভগ্ন প্রসাদ, নাচঘর-নিজের কল্পনা ও বাস্তব নক্সার জ্ঞান মিশিয়ে তার জাতিস্মর সত্ত্বার জাগরণ ঘটিয়ে বিশাল ক্যানভাসে এঁকে দিয়েছে রাজপ্রসাদের এক অনুপম ছবি। যে প্রাসাদ দেখেছিল বনকেল্লার পুরানো বাসিন্দারা। বিশ্বায়নের আগ্রাসনে হারিয়ে গেছে বাস্তবের বনকেল্লা। আর নিজের জীবন দিয়ে, শিল্পীর সত্ত্বা দিয়ে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বনকেল্লাকে অমর করে বাঁচিয়ে রেখেছে রচনার ক্যানভাস। উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদের শুরুতে রচনার স্বপ্নকে স্বীকৃতি দিতে ঔপন্যাসিক দুটি ছত্রে তুলে ধরেছেন নতুন বিশ্বভাবনার অভিব্যক্তি –

“একজন ছবি এঁকে গিয়েছে নীরবে
বলে গেছে বিশ্বগ্রাম বনকেল্লা হবে।”[১৪]

‘রূপকথা ফিরে আসে’ উপন্যাসে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অনন্য সংযোজন গাছবুড়ো চরিত্র। বিয়ে হয়ে গ্রামে প্রবেশের পথে গাছবুড়োর সঙ্গে পরিচয় হয় রচনার। গাছবুড়ো নামটি তার ভারি অদ্ভুত বলে মনে হয়। মানুষটাকে নিয়ে রচনার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। সে জেনে যায় গাছবুড়ো গ্রাফটিং-এ অত্যন্ত দক্ষ মানুষ। রাজবাড়িক মেজ তরফ যখন মোটর গাড়ির জন্য শিশু গাছটিকে কেটে ফেলে তখন গাছবুড়ো পাগলের মত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরেছে। আর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ক্রমাগত উচ্চারণে ‘জাহান্নম। জাহান্নম। সব জাহান্নমে। ... ছিয়েফসি, ছিয়েমসি!” গাছকাটার পর থেকেই গাছবুড়ো বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ পায়।

বসন্তকাল একদিকে বনকেল্লার গাছগুলি ফুলে-ফুলে ভরে উঠছে আর অপরদিকে চলছে রাজশক্তির বৃক্ষচ্ছেদন। গাছবুড়ো দিন-দিন আশা হারিয়ে ফেলছে। উন্মাদপ্রায় অবস্থায় ছুটে বেড়ায় গোটা এলাকা জুড়ে আর জানিয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যায় আশঙ্কার কথা। সে হারিয়ে ফেলে তার জীবনী শক্তি। রচনা যেখানটায় শিশুচারা পুঁতেছিল তার বাঁশের বেড়ার ঘেরার ভিতরে ঢুকে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে গাছবুড়ো আর বিড় বিড় করে বলতে থাকে —

> "ওরা সবুজ বাড়ি বানাচ্ছে। ইস, কী দুর্ভোগ মানুষের! ... ছিয়েফসি, ছিয়েমসি।"[১৫]

এভাবে ওই ঘেরাটোপের ভেতর থেকেই গাছবুড়ো কৃষ্ণাভকে জানায় তার শেষ ইচ্ছা —

> "— দ্যাখ, আমি যদি মরে যাই, আমাকে দাহ করিসনে। এখানে যেমন আছি, তেমনি থাকব। দেখবি, আমি ঠিক আর একটা শিশু হয়ে জন্মাব এখানে।"[১৬]

গাছবুড়ো চোখবোজে। তার শরীর ক্রমশ নিথর হয়ে যায়। কৃষ্ণাভর চোখে জল এসে যায়। গাছবুড়োর মৃত্যুর পর রচনা এবং কৃষ্ণাভ দু'জনেই যায় তার কুটীরে। রচনার গাছবুড়োকে অন্তর দিয়ে বুঝতে পেরেছিল। তাই সে বেদনায় স্তব্ধ ও নিথর হয়ে পড়ে। তার ঘরের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো ছিল অসংখ্য বই আর টেবিলে অনেক ডায়েরি। সেই ডায়েরির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অজস্র লেখা—

> "গাছ বুড়ো কী পাগল, ডায়েরিতে লিখে গেছে কী সব অদ্ভুত স্বর্গ থেকে নেমে আসে সিঁড়ি নয়, রথ নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত।"[১৭]

কৃষ্ণাভ গাছবুড়োর লেখা ডায়েরিগুলো পড়তে পড়তে স্তম্ভিত হয়, শিউরে উঠতে থাকে তার সমস্ত শরীর। ডায়েরির পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে পৃথিবীর এক ভয়ঙ্কর পরিণতির গল্প। কৃষ্ণাভ ভালো করে জানলো গাছবুড়ো কেন সবসময় সতর্ক করতে চেয়েছিল, 'তার বিজ্ঞানচর্চিত জীবন দিয়ে গোটা বনকেল্লা আর রাজভূমির মানুষকে।'[১৮] টেবিলের খাতার স্তূপ থেকে কৃষ্ণাভ খুঁজে পায় গাছবুড়ো কথিত 'সবুজ বাড়ি'[১৯]-র রহস্য এই সবুজ বাড়ি আসলে গ্রিণ হাউসের বিষয়। শীতের দেশে চারা গাছকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে বড় করে তুলতে তৈরী করা হয় এক ধরনের কাঁচের ঘর। সে ঘরে সূর্যের আলো সহজেই প্রবেশ করতে পারে। উত্তপ্ত হয়ে উঠে মাটি। সেই উত্তাপ কাঁচের ঘেরাটোপ পেরিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। এই ঘরকেই পরিভাষায় বলা হয় 'গ্রিণ হাউস'। এই ঘরের বৈশিষ্ট্য যে পরিমাণ বিকীর্ণ তাপ এই ঘরে প্রবেশ করে সেই উত্তাপ আর সেখানে থেকে বের হতে পারে না। গাছবুড়ো লিখেছেন—

> "আমরা বসবাস করি যে পৃথিবীতে তাও খুব দ্রুত পরিণত হতে চলেছে একটি বিশাল গ্রিণ হাউসে। ভুপৃষ্ঠের দশ কিলোমিটারের উপর প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরটির নাম স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এই অঞ্চলে সারা পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে ওজোন গ্যাসের স্তর। ওজোনের অনুতে থাকে তিনটি অক্সিজেনের পরমাণু।"[২০]

এর পরের ডায়েরিতে গাছবুড়ো লিখেছে অতিবেগুনি রশ্মির কথা। ওজোন স্তর এই রশ্মিকে কীভাবে শোষণ করে নেয়, তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে শুরু করে বিকিরণের নানা সূত্র ধরে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং ওজোন স্তর কীভাবে অতিবেগুণি রশ্মির হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছে তার তাত্ত্বিক আলোচনা। ওজোনস্তরের ধ্বংস নিয়ে নানা তথ্যের সংগ্রহ। গাছবুড়ো বারবার 'ছিয়েফসি বা ছিয়েমসি' বলে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত। ডায়েরিতে এর অর্থ এবং পরিবেশের ওপরে এর প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছে। সি. এফ. সি বা ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন, সি. এম. সি. বা ক্লোরো ফ্লুরো মিথেন গ্যাসের প্রয়োজন হয় ফ্রিজ, এ.সি., নানা ধরনের প্লাস্টিকের বাক্স, বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ও রঙ তৈরি করতে। এই C. F. C এবং C. M. C. ওজোন স্তরের ক্ষতির প্রধানতম কারণ।

একটি ডায়েরিতে আছে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের ও বাতাসে এর পরিমান বৃদ্ধির তথ্য। প্রাকৃতিক চক্র যে এই কার্বন-ড্রাই-অক্সাইডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এবং বায়ুমণ্ডলে এর বৃদ্ধিই যে গোটা পৃথিবীকে একটি গ্রিণ হাউস বানিয়ে ফেলছে তার অনুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ ও পৃথিবীর উষ্ণায়ণ সম্পর্কিত নানা তথ্য। পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন যে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তার ভয়ঙ্কর সব পরিণাম লেখা আছে ডায়েরিতে।

একটি ডায়েরিতে তিনি লিখেছেন, অ্যাসিড বৃষ্টির রহস্য। সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড কীভাবে মেঘের জলকণায় মিশে গিয়ে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতে পারে তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং তথ্য জানিয়েছে গাছবুড়ো। বর্তমান পৃথিবীর পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এক চরম সংকটময়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তুলে ধরেছে সে। বাহ্যত উন্মাদ প্রায় গাছবুড়ো কতবড় বিজ্ঞানসেবক এতদিন কেউ জানত না। প্রকৃতির প্রতি তার নিগূঢ় পর্যবেক্ষণকে তিনি সঞ্চয় করে রেখেছেন তার ডায়েরির পাতায় পাতায়। যেমন করে রচনা বনকেল্লাকে এঁকে রেখে গিয়েছে তার অসংখ্য ক্যানভাসে রূপে রং-এ রেখায়। ঔপন্যাসিক গাছবুড়ো চরিত্রটি নির্মাণের মধ্য দিয়েই তাঁর পরিবেশ বীক্ষাকে প্রকাশ করেছেন এক সুনিপুণ কৌশলে।

চার

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপকথা ফিরে আসে' উপন্যাসটির রচনা কৌশল অভিনব। উপন্যাসের নায়িকা রচনা প্রত্যক্ষভাবে একজন কিন্তু পরোক্ষভাবে দুজন। আবার এই দু'জন রচনাও রানিমা ভিন্ন হয়েও অভিন্ন সত্ত্বা। একজন বনকেল্লাকে গড়ে তুলেছিল নিজের হাতে গাছ রোপণ করে। সেই সাজানো বনকেল্লার একটি গৃহে বধূ হয়ে এসেছে রচনা। একটি গাছের মৃত্যুর প্রতিবাদে আত্মহত্যা করেছিল রানিমা। আর সমগ্র বনকেল্লার বৃক্ষরাজিকে উজাড় হতে দেখে চরম অসহায়তায় আত্মহত্যা করেছে শিল্পী রচনা। রানিমার পদক্ষেপে অন্তত সেই সময়ের জন্য বনকেল্লার প্রকৃতিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। রচনার সময়ে সভ্যতার আগ্রাসন থেকে বনকেল্লাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে। তাই ছবিতে সে তুলে রেখেছে হারিয়ে যাওয়া বনকেল্লার সৌন্দর্যকে। তাই দুই প্রজন্মের দুটো সত্ত্বা এমন একাকার হয়ে মিশে আছে যে তাদের পৃথক করা যায় না।

অপরদিকে, সাধারণ দৃষ্টিতে বনকেল্লার রাজা পদ্মরাজ থেকে শুরু করে রাজ পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের চম্পকরাজ এবং বিশ্বরাজদেরকে খলনায়ক বলে মনে হয়। কৃষ্ণাভ সাধারণ চোখে নায়ক। অথচ নিবিড় নিরীক্ষণে সেও যে, খলনায়কেরই ভূমিকায় অবতীর্ণ পাঠককে ঔপন্যাসিক সেটা বুঝতেই দেন না। উপন্যাসের শুরুতে কৃষ্ণাভ যতক্ষণ কবি ততক্ষণ তার ভূমিকা নায়কোচিত। কিন্তু রচনাকে বিয়ে করে সংসার গড়ে তোলার পর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আপোস করতে করতে সে হয়ে ওঠে একজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। যে কবিতা একসময় ছিল কৃষ্ণাভর সামগ্রিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ সেই কবিতা দিনে দিনে হয়ে পড়ে ব্যবহারিক জীবনে তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রকাশ। উপন্যাস জুড়ে রচনার মুখে মুখে উচ্চারিত হয়েছে আগে লেখা কবিতার অসংখ্য পংক্তি অথচ কৃষ্ণাভর বিবাহ পরবর্তী সময়ের কবিতা রচনার কণ্ঠে প্রায় অনুচ্চারিত। কৃষ্ণাভ যতই আধুনিক সভ্যতার অগ্রগমনের পক্ষ নিয়ে রচনাকে বোঝাতে থাকে ততই যেন রচনার কাছ থেকে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে।

বনকেল্লা উজাড় হয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণাভ বসেছে কবিতা লিখতে কিন্তু আসছে না কোনো পঙ্ক্তি। যেন হারিয়ে গেছে তার কলম থেকে সমস্ত শব্দ। রচনা লক্ষ করে কৃষ্ণাভর হতাশা, বিরক্তি আর যন্ত্রণা। তারপর পাগলের মত খিলখিল করে হেসে উঠে বলে —

> "তুমি আর কবিতা লিখতে পারবে না।"[২১]

কৃষ্ণাভ জানতে চায় রচনা কেন তাকে এভাবে বলছে। তখন রচনা যা বলে তার মধ্যে ফুটে ওঠে উপন্যাসের দর্শন—

> "অ্যাজ দি সিভিলাইজেশন আডভান্সেস, পোয়েট্রি ডিক্লাইনস।"[২২]

কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে রচনা কৃষ্ণাভকে বুঝিয়ে দেয় পরিবেশ ধ্বংস করে সাম্প্রতিক উন্নয়নের নামে যা চলছে তার প্রতি মানসিক পক্ষপাত দেখিয়ে কৃষ্ণাভ আসলে নিজেকেই ধ্বংস করেছে। তার ভেতর থেকে হারিয়ে গেছে প্রেমিকের সত্ত্বাটি। যে টিকে আছে সে একজন আধুনিক বস্তুপ্রেমী মানুষ মাত্র। আর এই বস্তুপ্রেমী বা Materialist আর যাই হোক কবি হতে পারে না, প্রেমিক হতে পারে না। রচনা এমন প্রেমহীন কৃষ্ণাভর কাছে একটি শরীরী অস্তিত্ব বা মেটেরিয়াল হয়ে গেছে, এটা রচনার মত প্রেমময়, প্রাণময় মানবীর কাছে চরম অপমানের। তাই সে রূপকথার রানিমার মতই রানি সায়রের গভীর জলে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণময় অস্তিত্বের মর্যাদাকে রক্ষা করেছে।

তাই 'ইকোফেমিনিস্ট' দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এই উপন্যাসটি অনন্য স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। নারী এবং প্রকৃতির পরম্পরাগত আত্মিক সম্পর্কের চিত্রায়ণ এই উপন্যাসে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ঘটেছে। ঔপন্যাসিক তার অপূর্ব নির্মাণ কৌশল প্রদর্শন করেছেন ঔপন্যাসটিকে রসোত্তীর্ণ করে তোলার জন্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 328 - 336
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, রূপকথা ফিরে আসে, প্রথম প্রকাশ, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৯

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, দ্বৈরথ, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ব্লার্গ অংশ

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, নদী মাটি অরণ্য (১ম খণ্ড) প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ব্লার্গ অংশ

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, দ্বৈরথ, পৃ. ব্লার্গ অংশ

৫. Garred, Greg, Ecocriticism : The New Critical Idiom, First Ed., Rutledge, USA, 2012, P. 5

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, রূপকথা ফিরে আসে, পৃ. ১১

৭. তদেব, পৃ. ৫১

৮. তদেব, পৃ. ৩৪

৯. Zamora, Lois Parkinson & Faris, Wendy B. (Edited), Magical Realism: Theory, History Community, 1st Ed., Duke University Press, London, 1995, P. 15

১০. রায় চৌধুরী, সমীর, ইকোফেমিনিজম : পরমা প্রকৃতিবাদ নারীবাদী তত্ত্বের বহুকৌণিক আলোচনা সংকলন, দ্বিতীয় সং, আবিষ্কার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৬২ - ১৬৪

১১. বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ, পরিবেশকেন্দ্রিক পাঠ ও বাংলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, দে পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৪২

১২. পাল, গৌতম, পরিবেশ ও দূষণ পরিবেশ বিজ্ঞান, তৃতীয় সং, পুনর্মুদ্রণ, দাসগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭

১৩. তদেব, পৃ. ১৮

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, রূপকথা ফিরে আসে, পৃ. ১৩৮

১৫. তদেব, পৃ. ১৩৮

১৬. তদেব, পৃ. ১৫০

১৭. তদেব, পৃ. ১৫০

১৮. তদেব, পৃ. ১৫০

১৯. ভুক্ত, অনিন্দ্য, পরিবেশ অভিধান, ১ম প্রকাশ, প্রগতিশীল প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২২০

২০. তদেব, পৃ. ১৫১

২১. তদেব, পৃ. ১৫৫

২২. তদেব, পৃ. ১৫৫